বিশ্ব শিক্ষক দিবস

৫ অক্টোবর ২০২৪

স্মারকপত্র

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন কমিটি

১. প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার, প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর	সভাপতি
২. প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান, প্রক্টর	সদস্য
৩. ড. মো. আমিরুল ইসলাম, ছাত্র-উপদেষ্টা	সদস্য
৪. প্রফেসর ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, অর্থনীতি বিভাগ	সদস্য
৫. প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, আরবী বিভাগ	সদস্য
৬. প্রফেসর মুহাম্মদ সাজ্জাদুর রহিম, পরিচালক, অফিস অব দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স	সদস্য
৭. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম, প্রশাসক, গ্রন্থাগার	সদস্য
৯. এ এইচ এম আসলাম হোসেন, উপ-রেজিস্ট্রার (একাডেমিক), একাডেমিক শাখা	সদস্য-সচিব

স্মারকপত্র

সম্পাদনা: প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার

বিশেষ সহযোগিতা : প্রফেসর ড. মো. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
ড. মো. ফজলুল হক তুহিন

প্রকাশনায়: জনসংযোগ দপ্তর, রাবি
প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৪
মুদ্রণ সংখ্যা : ৭০০

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

মুদ্রণে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানা

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা	১
বিশেষ নিবন্ধ	৩
বৃত্তি ও ভক্তি: বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে কার্ল মার্কস/সলিমুল্লাহ খান	
সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষক পরিচিতি	৮
প্রধান অতিথির বক্তব্য	১৩
উপাচার্যের বক্তব্য	১৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের অনুভূতি	১৯
রচনাসমূহ: স্নাতক পর্যায়	২৩
রচনাসমূহ: স্নাতকোত্তর পর্যায়	৩১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

প্রসঙ্গ কথা

স্বাগত বক্তৃতা: প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার

১৯৬৬ সালে শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে শিক্ষকদের মর্যাদা ও দায়িত্বের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা গৃহীত হয়েছিল। এর ২৮ বছর পর ১৯৯৪ সালের ৫ অক্টোবর প্রথমবারের মতো পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এখন প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০২২ সাল থেকে দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হচ্ছে । এ বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে দিবসটি গুরুত্বসহকারে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রথমবারের মতো এবার এই দিবসটি পালন করে।

এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- Valuing teacher voices: Towards a new social contract for education বা 'শিক্ষকের কণ্ঠস্বর: শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার'। এই প্রতিপাদ্যের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এবারের প্রতিপাদ্যে শিক্ষকরা জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সেটিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়গুলোতে কার্যকরভাবে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকরা যে ভূমিকা পালন করেন, সেই ভূমিকা অনুযায়ী পলিসি মেকিং পর্যায়ে তাঁদের যেমন অংশগ্রহণ নাই, তেমনি স্বীকৃতিও নাই। সেই স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা, যার প্রকাশ ঘটাতে হবে দৃশ্যমানভাবে।

শিক্ষকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, শিক্ষকগণের সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসছেন না। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকতে হবে, থাকতে হবে প্রণোদনা। আরো থাকতে হবে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিযোগিতা। শিক্ষকগণের প্রয়োজন সম্মান ও মর্যাদা।

একজন সুশিক্ষক তাঁর আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। শিক্ষকগণের কিভাবে প্রকৃত সম্মান অর্জনের পথে হাঁটা যায়, সেটি আজকের মুখ্য আলোচনা হতে পারে। আগামীর পৃথিবী বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে অন্যান্য পেশার চেয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা ও গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়, বরং বহুগুণ বেশি। সেই প্রত্যয় নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে পৃথিবীর সব শিক্ষককে আন্তরিক অভিনন্দন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের অংশ হিসেবে ছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভা, শিক্ষক সম্মাননা প্রদান ও রচনা প্রতিযোগিতা।

রচনা প্রতিযোগিতা দুটো গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতক পর্যায়ে 'আমার দেখা সেরা শিক্ষক' এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'আমার শিক্ষককে আমি যেভাবে দেখতে চাই'। প্রাপ্ত রচনাসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের পরিচয় মূল্যায়নকারীদের কাছে অজানা ছিল। আমরা দুই গ্রুপে ৩ জন করে ৬ জনকে নির্বাচিত করেছি। তাদেরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হচ্ছে- স্নাতক পর্যায়ে, প্রথম স্থান মো. শামিম আলম, সমাজকর্ম বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান হল; দ্বিতীয় স্থান রাফায়েতুল আহম্মেদ, নাট্যকলা বিভাগ, শহীদ হবিবুর রহমান হল ও তৃতীয় স্থান মোসা. ফাহিমা খাতুন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম খালেদা জিয়া হল। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম স্থান মো. বায়েজিদ, আরবী বিভাগ, শাহ্ মখদুম হল; দ্বিতীয় স্থান মো. মিনহাজুল আবেদীন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মতিহার হল; ও তৃতীয় স্থান মো. হাবিবুর রহমান, রসায়ন বিভাগ, নবাব আব্দুল লতিফ হল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষকগণের মধ্যে থেকে ৩ জন শিক্ষককে এ বছর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন- ড. দাস বাসুদেব কুমার, প্রফেসর (অব.), রসায়ন বিভাগ; ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম, প্রফেসর (অব.), পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর ইমেরিটাস ও সাবেক উপাচার্য, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম; ড. মু. শামসুল আলম, বীর প্রতীক, প্রফেসর (অব.), ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ। সম্মাননা প্রদানের ধারাবাহিকতায় আগামীতে আমরা অন্যান্য গুণী শিক্ষকগণকেও সম্মানিত করতে পারবো।

এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের আয়োজন নিয়ে একটি স্মারক প্রকাশনার পরিকল্পনা ছিল। এই স্মারকপত্রটি তারই স্বাক্ষর।

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের আয়োজন সফল করতে যাঁরা অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর
ও
সভাপতি
বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন কমিটি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ এর আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য, ঈষৎ সম্পাদিত

বিশেষ নিবন্ধ

বৃত্তি ও ভক্তি: বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে কার্ল মার্কস

সলিমুল্লাহ খান
প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
সাবেক শিক্ষক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে
শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"
শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে
মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া
মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"
এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"
প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"
প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"
"আর কি আছে? আর কি দিব?"
তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"
–বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, 'উপক্রমণিকা'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের–১৮৮২ সালে প্রকাশিত–'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিধৃত এই 'ভক্তি'র সহিত ১৮৩৫ সালে কার্ল মার্কস রচিত এক নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই অপরিসর নিবন্ধে আমরা সেই মিলের কথাটা আলোচনা করিতে চাই। কার্ল মার্কস জন্মিয়া ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বেশি আগে নয়–মাত্র কুড়ি বছর আগে–১৮১৮ সালে। সতের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন জার্মানির পশ্চিমে রাইন অববাহিকার অন্তর্গত ট্রিয়ের নামক এক মফস্বল শহরে। ১৮৩৫ সালের মাঝামাঝি সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশুনা শেষ করেন।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তাঁহাকে নির্ধারিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইয়াছিল। বিষয়: "বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে তরুণের ভাবনা।" ঘটনাচক্রে কালের প্রহার এড়াইয়া প্রবন্ধটি বাঁচিয়া গিয়াছে। লেখাটি ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে–অর্থাৎ আদি রচনার একেবারে নব্বই বছর পর। সতের বছর বয়সী কার্ল মার্কসের এই প্রবন্ধ পরকালে অনেক প্রবীণ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন ভবিষ্যতে যে চিন্তাধারার জন্য মার্কস বিশ্ববিখ্যাত হইবেন ইহাতে তাহার কিছু কিছু আভাস মেলে। আমরাও দেখিলাম, ১৮৮২ সালে বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' কাহিনীর গোড়ায় যে 'ভক্তি'র কথা বলিয়াছিলেন অতি তরুণ জার্মান কার্ল মার্কসের প্রবন্ধে তাহারও খানিক পূর্বাভাস আছে।

১

"বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে তরুণের ভাবনা" প্রবন্ধের উপসংহারে মার্কস লিখিয়াছিলেন: "পেশা নির্বাচনে যাহা আমাদের প্রধান পথ-প্রদর্শক হইতে বাধ্য তাহার মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ আর আমাদের আপন আপন উৎকর্ষসাধনের পরাকাষ্ঠা।" মার্কসের মতে এই দুই পথ-প্রদর্শকের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ আবিষ্কার করার অবকাশ নাই। কেন নাই তাহার একটা ব্যাখ্যাও হাজির করিয়াছিলেন তিনি। তাঁহার মতে এই দুই পথ-প্রদর্শক স্বার্থের মধ্যে সহি কোন বিরোধ নাই। একটি অর্জন করিলে অন্যটি নষ্ট হইবে না। মানুষের স্বভাবই বরং এমনভাবে গড়া যে অন্য মানুষের পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য, তাহাদের কল্যাণের স্বার্থে, কাজ করিয়াই মাত্র মানুষ নিজের পরিপূর্ণ উন্নতি অর্জন বা উৎকর্ষসাধন করিতে পারে।

মার্কস লিখিয়াছেন, কোন মানুষ যদি শুধু নিজের জন্যই কাজ করেন, তবে তিনি বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানী, মহান ঋষি-দরবেশ, উঁচুদরের কবি-সাহিত্যিক হইয়া উঠিলেও উঠিতে পারেন, তবে কখনো পরিপূর্ণ, সত্যিকারের মহৎ মানুষ হইতে পারেন না। তাঁহার মতে, ইতিহাসে সে সকল মানুষই সবার চেয়ে বড় বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন যাঁহারা দশের স্বার্থে কাজ করিয়া নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর আমরা জানি যিনি সর্বাধিক মানুষকে সুখী করিয়াছেন–অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়–তিনিই সবার চেয়ে সুখী।

মার্কসের জন্মের এক বছর আগে মাত্র তাঁহার পিতা–হাইনরিশ মার্কস–আপনার জাতিগত ও চিরাচরিত ইহুদি-ধর্ম ত্যাগ করিয়া মার্টিন লুথারের অনুগামী ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিষ্টধর্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই উত্তরাধিকারসূত্রে এই ভিন্নমতের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী পরিবারের সন্তান কার্ল মার্কস লিখিয়াছেন, "খোদ ধর্মই আমাদের এই শিক্ষা দিয়া থাকেন–যে আদর্শ অবতার সকলের সক্রিয় অনুকরণের পাত্র তিনি স্বয়ং মানবজাতির খাতিরে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর কাহার এমন সাহস যে এহেন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দাঁড়ায়!" বর্তমান নিবন্ধে আত্মত্যাগের এই মহান ব্রতকে–এক কথায় নিজেকে উৎসর্গ করার এই সরল মনকে–আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ঝুলি হইতে ধার করিয়া 'ভক্তি' নাম দিয়াছি। আমাদের বৃত্তি নির্বাচনে ভক্তির ভূমিকাই প্রধান। অন্তত অতি তরুণ মার্কস এই মতের পোষক ছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে: কোন যুক্তিক্রম অনুসরণ করিয়া অতি তরুণ কার্ল মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন? 'বৃত্তি নির্বাচন' প্রবন্ধের একেবারে গোড়ায় মার্কস হিসাব কষিয়াছিলেন, প্রকৃতি-জগতের আর দশ প্রাণীর সহিত মানুষের অনেক পার্থক্যের মধ্যে এক পার্থক্য ধরা পড়ে এই বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে। তিনি লিখিতেছিলেন, আর দশ প্রাণীর মত, "মানুষকেও বিধাতা একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই লক্ষ্য মানবজাতির মর্যাদা এবং তাহার নিজের মান-মর্যাদার বৃদ্ধিসাধন করে; কিন্তু কোন পথে এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করার কাজটা তিনি মানুষের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সমাজের কোন কাজটিতে তাহাকে সবচেয়ে বেশি মানাইবে, যাহা করিয়া তিনি নিজের ও সমাজের অধিক উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন তাহা নির্বাচন করিবার ভারও তিনি তাহার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

নির্বাচন করিবার অবকাশটা তাহার পক্ষে আর দশ প্রাণীকে ছাড়াইয়া উঠিবার পক্ষে সহি বড় সুযোগ বিশেষ। তবে সুযোগটা যুগপদ এমন একটা কাজ বটে যাহাতে ভুল হইলে তাহার গোটা জীবনই চুরমার হইয়া যাইতে পারে। সমস্ত আশা-ভরসা নস্যাৎ হইতে পারে। আর তাহাকে করিতে পারে সুখশান্তিবিহীন। "এ কারণেই যে তরুণ নিজের জীবনটা মাত্র শুরু করিতেছেন আর আপন জীবনের সহি বড় আদি ও আসল বিষয়-আশয় ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে নারাজ তাহার নিশ্চিত প্রথম করণীয় এই নির্বাচনের সুযোগটা ভালোমত ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজে লাগানো।"

এই নির্বাচনের পথে মানুষের প্রধান সমস্যা নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করা। মানুষের একটা না একটা লক্ষ্য স্থির থাকে আর সে লক্ষ্যটাই–তাহার চোখে–সকল লক্ষ্যের মধ্যে সেরা বলিয়া প্রতিভাত হয়। আসলেও তাহাই। তবে যদি তাহা অন্তরের অন্তস্থল হইতে আদিষ্ট হইয়া থাকে, যদি মাত্র প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহার পক্ষের আওয়াজ শোনা যায়। মার্কস লিখিয়াছেন, "কেননা, ঈশ্বর নশ্বর মানুষকে কখনো কোন না কোন পথের দিশারী নিযুক্ত না করিয়া একেলা ছাড়িয়া দেন না, তাঁহার বাণীর স্বরটা নীচু, কিন্তু নির্ঘাত লক্ষ্যভেদী।"

২

সমস্যার মধ্যে, আওয়াজটা সহজেই শোরগোলে ডুবিয়া যাইতে পারে। যাহাকে আমরা অন্তরের অন্তস্থল হইতে নিঃসৃত আদেশ মনে করিয়াছি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে হইতে পারে ক্ষণিকের উত্তেজনা বিশেষ, আরেকটা ক্ষণের উত্তেজনায় তাহার শেষও হইয়া যাইতে পারে। "আমাদের মানসছবিতে–হইতে পারে–কেহ বা আগুন লাগাইয়া

দেয়, আমাদের রাগ-অনুরাগ তাতিয়া উঠে, আমাদের চোখের সামনে ভূত-প্রেত উড়াউড়ি করে। আর আমরা তাড়াখাওয়া প্রবৃত্তি যে আদেশ দেয় তাহা মানিয়া সরাসরি সামনে ঝাঁপ দিই, মনে করি স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছেন। আর বেশিক্ষণ না যাইতেই আমরা যাহা একদিন প্রাণাবেগে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম তাহা পরিত্যাজ্য মনে করি। আমাদের গোটা জীবনটাই বরবাদ হইয়া যায়।" এই কারণেই ভালোমত ভাবিয়া দেখিতে হয়, যাচাই করিতে হয়, বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সত্য সত্যই অন্তরের আদেশ পাইয়াছি কিনা, অন্তরের অন্তস্থলে শ্রুত আওয়াজ ইহার অনুমোদন করিয়াছে কিনা, কিংবা নিশ্চিত হইতে হয় অন্তরের এই আদেশটা মূলে মায়া-মরীচিকা মাত্র কিনা। অথবা যাহাকে আমরা এতক্ষণ বিধাতার আহবান মনে করিয়াছি তাহা এক প্রকার আত্ম-প্রতারণা কিনা।

এই সংশয়ের কারণ এই যে, চকচক করিলেই সোনা হয় না। চকচকে পদার্থ দেখিয়াই আমাদের উচ্চাভিলাষ জন্মায় আর উচ্চাভিলাষ সহজেই অন্তরের আদেশ (অথবা আমরা যাহা অন্তরের আদেশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা) প্রসব করিতে পারে। উচ্চাভিলাষের দানব একবার যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বিচারবুদ্ধি তাহাকে নিরস্ত বা নিবৃত্ত করিতে পারে না। তাড়াখাওয়া প্রবৃত্তি যাহা আদেশ করে তিনি তাহাতেই সরাসরি ঝাঁপাইয়া পড়েন। ফল দাঁড়ায় এই, তিনি আর জীবনের বৃত্তি নির্বাচন করেন না, তাহার বৃত্তি নির্ধারিত হয় ভাগ্য আর মায়ার হাতে।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে আর সকলের তুলনায় উজ্জ্বলতর, বেশি ঝকঝকে, সুযোগ-সুবিধা হাত করা যায় তাহা নির্বাচন করাও আমাদের পক্ষে উচিত হয় না। এই বৃত্তি সেই বৃত্তি নয় যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া অবলম্বন করিলেও আমাদিগকে ক্লান্ত করিবে না, আমাদের উৎসাহে কখনো ভাঁটা পড়িবে না, কিংবা আমাদের উদ্দীপনা শীতল হইতে দিবে না। এই বৃত্তি সেই বৃত্তি যাহার কারণে আমরা বড় বেশিদিন যাইতে না যাইতেই দেখিব আমাদের বাসনা এখনো অপূর্ণ, আমাদের ধ্যানধারণা এখনো অতৃপ্ত, বিধাতার নিন্দায় আমরা মুখর আর মানবজাতির উদ্দেশ্যে অভিশম্পাৎ বণ্টনে অকৃপণ।

যে কারণে আমরা বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে হঠাৎ অনুরক্ত হইয়া পড়ি তাহার নাম শুদ্ধমাত্র উচ্চাভিলাষ নহে। ঐ বৃত্তিটাকে আমরা হয়তো মানসছবি আমাদের আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সাজাইয়াছি কিংবা এমনভাবে সাজাইয়াছি যে মনে হইবে, ইহার অধিক মর্যাদাবান জিনিশ এই জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা তাহার গুণাগুণের বিচার-বিশ্লেষণ করি নাই, তাহার পুরো দায়ভারটা কতখানি ওজনের তাহাও ভাবিয়া দেখি নাই। দেখি নাই তাহার সুবাদে কত বড় একটা দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চড়াও হইবে। এক কথায়, বিষয়টা আমরা মাত্র কিছুটা দূর হইতেই দেখিয়াছি। আর কে না জানে দূরত্ব প্রতারক বটে।

এই পর্যায়ে বিশেষত তরুণদের–পক্ষে একান্ত বিচারবুদ্ধিও খুব নির্ভরযোগ্য হয় না। কারণ একদিকে অভিজ্ঞতার অভাব, অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ শক্তির ঘাটতি। এই বয়সে ভাবাবেগের তোড়ে বিচারবুদ্ধি ব্যাহত হয় আর উৎকল্পনার ঝলকে তাহা অন্ধ হইয়া যায়। এহেন অবস্থায় তরুণেরা হয়তো পিতা-মাতার শরণাপন্ন হইতে পারেন। কারণ তাঁহারা জীবনের দীর্ঘ পথ পার হইয়া আসিয়াছেন আর ভাগ্যের বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া পরীক্ষিতও হইয়াছেন।

এতসব বিচার-বিবেচনার পরও যদি কোন বৃত্তির আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া থাকে–ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিবার পরও যদি সে আকর্ষণ অক্ষুণ্ন থাকে–এই বৃত্তির সহিত বিজড়িত দায়-দায়িত্ব কতখানি তাহারে খবরাখবর লইবার আর সংশ্লিষ্ট বিপদ-আপদের কথা জানিবার পরও যদি কোন তরুণ মনে করেন এই বৃত্তিই তাহার নিয়তি তবে সে বৃত্তিই তাহার অবলম্বন করা উচিত। 'বৃত্তি নির্বাচন' প্রবন্ধের প্রথম ভাগে মার্কস এই সিদ্ধান্তে স্থির হইলেন। কার্ল মার্কসের বিচারে, এই সকল কথার গোড়ার কথা বৃত্তি নির্বাচনটা অন্তরের সত্যকার নির্দেশ অনুসারে হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।

৩

ইহার পরও কিছু সমস্যা থাকিয়া যায়। মার্কসের বিবেচনায় যে বৃত্তিকেই আমরা আমাদের নিয়তি মনে করি না কেন, আমরা সবসময় তাহার নাগাল পাইতে সক্ষম হই না। তিনি লিখিতেছেন, "সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে কোনখানে আমাদের স্থান আমরা তাহা নির্ধারণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবার আগেই সে সম্পর্করাজি বেশ কিছু পরিমাণে নির্ধারিত হইয়া যায়।" এই সামাজিক বাধা-বিপত্তির বাহিরেও কিছু বাধা থাকে। শারীরিক যোগ্যতার প্রশ্নটিও এখানে মার্কসের বিচারে অবান্তর নয়। দৈহিক অযোগ্যতা অনেক বৃত্তির পক্ষে হুমকিস্বরূপ আর তাহাকে হালকা করিয়া দেখা চলে না–তাহা লইয়া মশকরা করা সাজে না।

দৈহিক যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাটা ছাড়িয়া দিলেও মেধা বা প্রতিভার প্রশ্নটাও প্রতীক্ষায় থাকে। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে অকুলান হইয়াও অনেক সময় আমরা কষ্টেসৃষ্টে দায়দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। "কিন্তু"–মার্কস লিখিতেছেন, "আমরা যদি এমন কোন বৃত্তি বাছিয়া লই যাহার যোগ্য মেধা বা প্রতিভা আমাদের নাই, তখন আমরা কদাচ ঐ বৃত্তির মর্যাদা রক্ষা করিবার উপযোগী দায়িত্ব দক্ষতার সহিত পালন করিতে পারিব না, আর বেশিদিন না যাইতেই লজ্জায় অধোবদন হইব। ঠাহর করিব আমরা কাজটার পরিমাপে যোগ্য হই নাই আর মনে মনে বলিব আমরা যত্তসব অকর্মার ধাড়ি, সমাজের দেওয়া বৃত্তি অবলম্বনে অক্ষম গলগ্রহ।"

ইহা হইতেই মানুষের মনে আত্মগ্লানির উদ্ভব হয়। ইহাকে এক অর্থে প্রকৃতির বা স্বভাবের প্রতিশোধ গণ্য করা চলে। ভালোমত খোঁজ-খবর লইয়া জানিলাম যে যোগ্যতা থাকিলে এই বৃত্তির উপযোগী প্রয়োজনীয় কাজ হইবে সে যোগ্যতা আমাদের নাই। তারপরও যদি আমরা মনে করি যোগ্যতাটা আছে তবে তাহা এমন এক ধরনের ভুল হইবে যাহা পরে কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে থাকিবে। মার্কস লিখিতেছেন, "তাহাতে যদি বাহিরের দুনিয়ার গালমন্দ দুই কথা নাও শুনিতে হয়, সেই গালমন্দের অধিক মন্দ–ভয়াবহ–অন্তরের বেদনায় হৃদয় পীড়িত হইবে।" সকল দিক ভাবিয়া, সার্বিক পরিস্থিতির অনুমোদন সাপেক্ষে কোন বৃত্তি গ্রহণ করা যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে সেই বৃত্তিটা অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইহাই ছিল আমাদের অতি তরুণ মার্কসের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত।

নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে মার্কস আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এতক্ষণ তিনি বলিতেছিলেন আমরা কোন বৃত্তির যোগ্য হইয়াছি কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এক্ষণে তিনি ভাবিতেছেন, আমরা যে বৃত্তিটা গ্রহণ করিব তাহা আমাদের গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে কিনা। আমরা সেই বৃত্তিই গ্রহণ করিব যাহাতে আমরা যথাযথ মর্যাদার অধিকারী বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারি। যে ধ্যানধারণার সত্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি তাহাদের ভিত্তিতে যে বৃত্তি কার্যকর–মানবজাতির কল্যাণে কাজ করিবার পক্ষে যে বৃত্তি প্রশস্ত ক্ষেত্রের যোগান দেয়–আর যে সর্বজনীন উদ্দেশ্যপূরণের পথে বৃত্তি মাত্রেই একেকটা উপায়স্বরূপ হয়–সেই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা অর্জনের স্বার্থে আমরা বৃত্তিটা অবলম্বন করিতে পারি। সেই জিনিশই তুল্যমূল্য যাহা মানুষের মূল্য বৃদ্ধি করে, যাহা মানুষের সকল কাজে–সকল প্রচেষ্টায়–উচ্চতা-সংযোগ করে, যাহা তাহাকে করিয়া তোলে অজেয়, সাধারণ লোকের চোখে শ্রদ্ধেয় এবং সকলের চেয়ে এক তাকিয়া উপরের।

৪

কোন বৃত্তিতে এই তুল্যমূল্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যাইবে? তরুণ কার্ল মার্কস লিখিতেছেন, "তুল্যমূল্যের নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতে পারে একমাত্র সেই বৃত্তিতে যে বৃত্তিতে আমরা নিতান্ত কাহারো বশংবদ হাতিয়ার নই, যাহাতে আমরা বরং আপন জগতে স্বাধীন অবস্থায় কর্তব্য পালন করিতে পারি। এই নিশ্চয়তা মিলিতে পারে একমাত্র সেই বৃত্তিতে যাহাতে কোন ঘৃণ্য কাজ–এমন কি ভাসা ভাসা রকমের ঘৃণ্য হইলেও–করিতে আমরা বাধ্য নই। যে বৃত্তিতে এই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা জোটে তাহা বৃত্তির রাজ্যে সর্বদা শীর্ষস্থানীয় হয় না, তবে তাহাই সদা শ্রেয়বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।" যে বৃত্তিতে তুল্যমূল্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না সে বৃত্তি

আমাদের অপমানিত করে। একইভাবে যে ধ্যানধারণা পরে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে তেমন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা বৃত্তির সম্মুখে আমরা পরাভূত হই। আত্মপ্রতারণা ছাড়া, আপনার বিশ্বাসকে আপনি হত্যা করা ছাড়া ইহার গত্যন্তর হয় না।

এক্ষণে কি দাঁড়াইল? শারীরিক সামর্থ্য, মেধা, বৃত্তির মর্যাদা প্রভৃতির শেষে আর একটি বিবেচনা বাকি রহিল। বিবেচনার এই বিষয়টা আরও গুরুতর। মার্কস লিখিতেছেন:

> যে তরুণের নীতিনৈতিকতা এখন পর্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নাই, যাহার সিদ্ধান্ত এখনও শক্তিশালী আর অটল হয় নাই তাহার পক্ষে যে সকল বৃত্তি স্বয়ং জীবনযাত্রার সহিত যতখানি সংশ্লিষ্ট নয় তাহার তুলনায় ঢের বেশি কতক বিমূর্ত বা অবয়বহীন সত্যের সঙ্গে জড়িত তাহাই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। তবে এই সকল বৃত্তি যদি যুগপদ আমাদের প্রাণের গহন প্রদেশে শিকড় গাড়িয়া বসে আর আমরাও যদি আমাদের জীবন আর তাবত কর্মপ্রয়াস ইহাদের অন্তস্থলে বিরাজমান ধ্যান-ধারণার খাতিরে উৎসর্গ করিতে পারি তখন দেখা যাইবে এই বৃত্তিগুলিই সর্বোচ্চ তুল্যমূল্যের অধিকারী।

যাহারা স্বভাবের প্রবর্তনায় এই জাতীয় বৃত্তির অনুগমন করিবেন তাহারাই সুখের কৃপালাভ করিবেন। আর যাহারা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ তাড়নার তোড়ে, বিশেষ ভাবনাচিন্তা না করিয়া, এই জাতীয় বৃত্তিতে নিয়োজিত হইবেন তাহারা জীবনটা নষ্ট করিবেন।

কার্ল মার্কস তাঁহার এই এচড়ে পাকা প্রবন্ধের উপসংহারে ভক্তির কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন। "আর কি আছে? আর কি দিব?" প্রশ্নটির উত্তর–তাঁহার মতেও–"ভক্তি"। তাঁহার জবানে, "আমাদের বৃত্তি যে সকল ধ্যানধারণার উপর দাঁড়ায় তাহাতে যদি আমাদের ভক্তি জন্মায় তবে সেই ভক্তির কল্যাণে আমরা সমাজের একেকটা উঁচু তাকিয়ায় জায়গা পাই, আমাদের তুল্যমূল্য বাড়িয়া যায়, আর আমাদের কাজকর্মও প্রশ্নাতীত একটা মর্যাদা লাভ করে।" আর যে মানুষ শুদ্ধ তুল্যমূল্যে উচ্চস্তরের বলিয়া কোন বৃত্তি নির্বাচন করিয়াছেন অথচ তিনি নিজে ঐ বৃত্তির যোগ্য হইয়া উঠেন নাই সে সত্য ভাবিতেই কাঁপিয়া উঠিবেন। তিনি তাই আর কোন কারণে না হোক, অন্তত সমাজে মর্যাদাপূর্ণ একটা আসনের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আচরণে যথাযথ মর্যাদা বজায় রাখিবেন।

দোহাই

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ,' ***বঙ্কিম রচনাবলী***, ১ম খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বিংশতম মুদ্রণ (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১০), পৃ. ৬৫৩-৭২৬।

২। Gareth Stedman Jones, ***Karl Marx: Greatness and Illusion*** (London: Allen Lane, 2016).

৩। Donald R. Kelley, 'The Metaphysics of Law: An Essay on the Very Young Marx,' ***American Historical Review***, vol. 83, no. 2 (April 1978), pp. 350-367.

৪। Sven-Eric Liedman, ***A World to Win: The Life and Works of Karl Marx,*** trans. Jeffrey N. Skinner (London: Verso, 2018).

৫। Karl Marx, 'Reflections of Young Man on the Choice of a Profession,' written August 10-16, 1835, trans. anonymous, Karl Marx and Frederick Engels, ***Collected Works***, vol. 1 (Moscow: Progress Publishers, 1975), pp. 3-9.

৬। J. E. Seigel, 'Marx's Early Development: Vocation, Rebellion, and Realism,' ***Journal of Interdisciplinary History***, vol. 3, no. 3 (Winter, 1973), pp. 425-508.

সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষক পরিচিতি

ড. দাস বাসুদেব কুমার

প্রফেসর (অব.), রসায়ন বিভাগ

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর ড. দাস বাসুদেব কুমার

ড. দাস বাসুদেব কুমার ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ও ১৯৬৭ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটি কার্বনডেল থেকে এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৬৮ সালে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ২০১০ সালে প্রফেসর হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর প্রায় ২৫টি প্রবন্ধ ও রসায়ন বিষয়ে ৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১টি পিএইচডিসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্নাতকোত্তর গবেষণা তত্ত্বাবধান করেছেন। রসায়ন বিভাগের সভাপতিসহ অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তিনি পালন করেন।